দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবাদ : লোকসমাজ-বৈশিষ্ট্য-ইতিহাস

বিচিত্র ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক শৈল্পিক, লোকসংস্কৃতির মৌলিক উপাদান অতীতকাল থেকেই বাঁকুড়া শহরকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। আদরণীয় লোকসাহিত্যের একটি মননশীল শাখা হল প্রবাদ, যা বাঁকুড়ার একান্ত নিজস্ব গৌরব। লোকমুখে প্রচলিত ও লোকশ্রুত বাহিত একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ শক্তিশালী দিক হল প্রবাদ। এই প্রবাদ সমাজ জীবনের দর্পণ স্বরূপ। যুগ যুগ ধরে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা গণের মুখে মুখে ধ্বনিত প্রবাদ আজও সাহিত্যের দরবারে আদৃত। তাই ভাষা ও সমাজ জীবনের গভীরে প্রবেশের সঠিক ও একমাত্র পন্থা হল প্রবাদ চর্চা। যেহেতু দীর্ঘদিনের প্রাত্যহিক ও সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল প্রবাদে পরিলক্ষিত হয়। সেহেতু প্রবাদগুলিকে পুখানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে লোকসমাজের ইতিহাস অনুসন্ধান করা যায়। প্রবাদ বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বুদ্ধিদীপ্ত রচনা, ব্যক্তি-দেশ-কাল-সমাজ সম্পর্কিত দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সত্যভাষণ যা ব্যপ্তি ও গভীরতার একটি বৈদগ্ধপূর্ণ বাক্য। প্রবাদ একটি জাতির মুকুর স্বরূপ, একটি জনগোষ্ঠির অভিজ্ঞার সংক্ষিপ্ত সরল অভিব্যক্তি। সমাজ-জাতির নিমগ্ন লোকাচার, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার, চিন্তা, চেতনা, নান্দনিক রুচি ইত্যাদি ব্যাক্তি থেকে বর্জিত সমষ্টির বৈদগ্ধপূর্ণ পরম্পরাগত বাক্য। যা একটি গোষ্ঠী জীবনের স্বতঃস্ফুর্ত মনের বহিঃপ্রকাশ। সহজ-সরল অভিজ্ঞতার সামাজিক প্রতিফলন। প্রবাদ সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক, নৃ-তাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করলে জনজীবনের উদ্ভব, ইতিহাস, সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হই। বস্তুতঃ হাসি-কান্না, রাগ-অভিমান, ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, খেলা-ধূলা, পঠন-পাঠন, শিল্প-সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যেকটি দিক প্রাত্যহিক জীবনের দৈনিন্দন অভিজ্ঞতার মর্ম নির্যাস, সংহত আকারের সুষ্ঠ প্রকাশ। প্রবাদ চর্চায় নিমগ্ন হলে এই অঞ্চলের ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস কতখানি বৈচিত্র্যপূর্ণ তা উপলব্ধি কর যায়। বস্তুতঃ বাঁকুড়ার প্রবাদের অনুসন্ধান-অনুধ্যান করার পূর্বে প্রবাদের সংজ্ঞা, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

প্রবাদের উৎস ও চর্চা :“বাংলা লোকসাহিত্যের ধাঁধা প্রবাদ ছড়া-গান-লোককথা প্রভৃতি সকল বিভাগই যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কিন্তু তথাপি লোকসাহিত্য চর্চার প্রথম যুগে বিশেষভাবে প্রবাদ চর্চার প্রতিই সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা গেছে। এর মুখ্য কারণ, প্রাত্যহিক জীবনে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত অপরাপর বিভাগগুলির তুলনায় প্রবাদের ব্যবহারিক গুরুত্বেই রয়েছে নিহিত।”[১] প্রাত্যহিক

জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল প্রবাদের মধ্যে নিহিত তাই বাংলার লোকসাহিত্য বিভাগে সর্ব প্রথম প্রবাদ চর্চার প্রতিই গুরুত্ব আরোপিত হয়। লোকসমাজে যেমন তার উদ্ভব, তেমনি লোকসংস্কৃতি বাহিত লোকের মুখে মুখে তার প্রচার ও প্রসার। সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতার পরিচয় প্রবাদে পাওয়া যায়। তাই এগুলি আপাত তুচ্ছ, কিন্তু স্বরূপত গভীর উক্তি, সাধারণের সম্পদ। তাই সহজ বোধ্য প্রবাদের আড়ালে জীবন্ত মানুষের কণ্ঠস্বর শ্রুতি গোচর হয়। পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিত মানুষের মুখ থেকে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত ফসল। এগুলি আপনা-আপনই সাধারণ মানুষের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়ে প্রচারিত। প্রবাদের আদি রচনাকারের নাম যেমন পাওয়া যায় না। তেমনি প্রবাদগুলি কবে রচিত হয়েছিল তারও হদিশ আজও পর্যন্ত মেলেনা। বলা যায়, প্রবাদের উৎস গ্রন্থাদি রচনার বহুযুগ পূর্বে, সহজ-সরল ভাষায় সাধারণ মানুষের কণ্ঠে থেকে আপনিই উৎসারিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রবাদের আদি স্রষ্টা সাধারণ মানুষ। আচার্য শ্রী সুশীল কুমার দে মহাশয় প্রবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন, “লোকোক্তি ও প্রাজ্ঞোক্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও ব্যবহারিক জগতে উভয়েই কার্যকরী।”[২] অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ছাড়াও ছিলেন জ্ঞানী পুরুষ (বিদ্যা ও বুদ্ধির রুচি সম্পন্ন)। পণ্ডিত বা মার্জিত পুরুষের সুবক্তব্য যা প্রাজ্ঞোক্তি নামে পরিচিত। বিশিষ্ট ব্যক্তির উক্তি বা প্রাজ্ঞোক্তি যা সাহিত্যের পাতায় স্থান পায়। “যদিও একদিকে লোকোক্তি, প্রাজ্ঞের চিন্তায় ও কর্মে প্রবেশ করে। অপরদিকে তেমনই প্রাজ্ঞোক্তি, লোকের দৈনিন্দন ভাষায় ও জীবনের বিস্তার লাভ করে।... গ্রন্থাকারের রচনায় প্রবাদ বাক্য স্থান পাইয়াছে।”[৩] অপরদিকে প্রবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রবাদ অনুরাগী সত্যরঞ্জন সেন মহাশয়ের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। প্রবাদের স্রষ্টা ও নির্দিষ্ট সময়কাল সম্পর্কে জ্ঞাত না হলেও “সত্যদ্রষ্ঠা আর্য ঋষিগণ কঠোর তপস্যা এবং একাগ্র ধ্যানের ফলে এক একটি কৃত সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এক একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন ... সেই রূপে ধর্ম ও নীতি সংক্রান্ত বহু উপদেশবাণী প্রবাদের আকারে উচ্চারিত হইয়াছিল।”[৪] এছাড়াও তাঁর মতে ভূয়োদর্শন জাত প্রবাদ, প্রেরণালব্ধ প্রবাদ, পারিবারিক সম্পর্ক থেকে প্রবাদের সৃষ্ট হয়েছিল বলে জানা যায়। সুতরাং প্রবাদের স্রষ্টা কোন একজন ব্যাক্তি নন, প্রবাদের স্রষ্টা হতে পারেন পণ্ডিত, কবি, কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী, ভূম্যধিকারী, জমিদার, হতে পারেন গৃহের কুলবধূ পরিচারিকা। যারা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। সুতরাং মানব সভ্যতার পত্তনের পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের মুখেই (মৌখিক ভাবে) প্রবাদের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। তার পরবর্তীকালে মুখে মুখে রচিত প্রবাদগুলি, মনিষী বা পণ্ডিতের

সংস্পর্শে এসে আভিজাতের রঙে-রাঙিত হয়ে সাহিত্যের দরবারে লৈখিক রূপে স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছিল। অতীতে বহির্বাণিজ্যিক সংযোগের মাধ্যমে প্রবাদ ভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রবাদ ভাণ্ডার শুধুমাত্র বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, দেশ-দেশান্তরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। মিশর, চীন, গ্রীস, স্পেন, ইতালি, জাপান, রুশ এর মতো দেশেও প্রবাদ ছিল বিলক্ষন সমৃদ্ধশালী। অপরদিক দিকে ভাষার ক্ষেত্রেও বাংলা ছাড়া সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, ইতালি, স্পেনীয়, ওড়িয়া, হিব্রু ভাষার অসংখ্য প্রবাদ পাওয়া যায় যা প্রত্যেক দেশের প্রচলিত প্রবাদের সাথে ভাব ও ভাষার কতখানি সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য এবং কতখানি বৈচিত্র্যপূর্ণ তা অনুসন্ধিৎসু সংগ্রাহকরাই উপলব্ধি করতে পারেন।

প্রবাদ শব্দের বুৎপত্তিঃ ‘প্র’ পূর্বক ‘বদ্’ ধাতু+অ = প্রবাদ। অর্থ হল প্র✓বদ্(বিশেষ)✓বলা +অ (ঘঞ) ভা অর্থাৎ প্রাজ্ঞোক্তি যা লোকপরম্পরা জনশ্রুতি। পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর “বঙ্গীয় শব্দকোষ” অভিধানে প্রবাদের ব্যাখা করেছেন, “পরস্পর কথোপকথন; সম্ভাষ পরস্পরাভিঘাত অন্যোন্যস্পর্ধা। লোকাপবাদ, লোকনিন্দা, পরম্পরাগত বাক্য; প্রসিদ্ধ লোকবাদ; কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ইত্যাদি অর্থে প্রবাদ শব্দটি প্রযুক্ত হয়।”[৫]

আদি স্রষ্টা যেই হোক না কেন, প্রবাদ যে সাধারণ মানুষের মনের অভিব্যক্তি যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত চটুল কথিত বাক্যগুলি পরবর্তীকালে বিশিষ্ঠ ব্যক্তির মুখে সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কথিত আছে সর্ব প্রথম বাইবেলে-সামুয়েলের প্রথম ভাগ “Wickedness Proceedth from the wicked” (বাইবেল 1sam.24.13)। যা সর্ব প্রাচীন প্রবাদ। যদিও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য মিশর দেশের “Book of the dead” পুস্তক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৭০০ অব্দে প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায় আনুমানিক “Path Hotep” তাঁর পুস্তকে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে প্রবাদের উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে ভারতবর্ষে প্রবাদের প্রাচীতম দৃষ্টান্ত ‘ঋকবেদে’ এ পাওয়া যায় উর্বশীর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃতঃ

> “ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
> সানাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা।।” (সংবাদ সুক্তে ২০/৯৫/১৫)

অথবা, ঘোষা কাক্ষীবতীর সে সরস উপমা :

"কো বাং শয়ুত্রা বিধবের দেবরং
মর্যং ন ঘোষা কৃণুতে সধস্থ আ।।" (অশ্বিনা-সূক্তে- ১০/৪০/২)

এছাড়াও বেদ, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এ প্রচুর প্রবাদ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যেও প্রবাদের কদর লক্ষ্য করা যায়। ১০ম-১২শ শতকে চর্যাপদে (বৌদ্ধ সহজিয়া কর্তৃক) যেমন প্রভূত প্রবাদ লক্ষ্য করা যায়। তেমনি ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গলকাব্য এমনকি অষ্টাদশ শতকের আধুনিক সাহিত্যে বহুল প্রবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন চর্যাপদে ৬ টি প্রবাদ লৌকিক ও মৌখিক রূপে দর্শিত :

১. "আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।" [৬]
২. "দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামাঅ।"[৭]
৩. "হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।"[৮]
৪. "বর শুন গোহালী কি মো দুঠ্য বলন্দ্যে।"[৯]

পরবর্তী সাহিত্য ১৩শ-১৫শ শতকের বৈষ্ণব কবি বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রায় ৩৬ টি প্রবাদ লক্ষ্য করা যায় যা আজও মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়ঃ

১. "ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ।"[১০]
২. "দেখিলা পাকিল বেল গাছের উপরে আরতিল কাক তার ভখিতেঁ না পারে।"[১১]
৩. "মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল"[১২]
৪. "কাটিল ঘাঅত লম্বুরস দেহ কত।"[১৩]

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যযুগের মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলেও অজস্র প্রবাদ ব্যবহার করেছেন কবিগণ। তেমনি অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়াও রামেশ্বরের শিবায়ণ, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরেও যথেষ্ট প্রবাদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়ঃ

১. "বিপাকে হরাই যদি হাতে পাইয়া নিধি।"[১৪]
২. "এক রাঁড়ে মজাইল লঙ্কার বসতি।"[১৫]
৩. "অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব / কি করিব বারিদ মেহে।"[১৬]
৪. "পরের বোলে কে বা প্রাণ ছাড়িবারে চায়।"[১৭]

এইরূপ অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রণীত ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যটি প্রবাদ-প্রবচনের জন্য সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছে সাহিত্যের দরবারে। এ বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না যে ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের জনপ্রিয় প্রবাদগুলির দৃষ্টান্ত আজও বই এর পাতায় লক্ষ্য করা যায়। যা বর্তমান সাহিত্যিকদের চলার পথে পাথেয়। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের ১৫টি প্রবাদ। যেমনঃ

১. “নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।”[১৮]

২. “হাভাতে যদ্যপি চায় / সাগর শুকায়ে যায়।”[১৯]

৩. “বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।”[২০]

৪. “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।”[২১]

৫. “মাতঙ্গ পড়িলে দরে / পতঙ্গ প্রহার করে।”[২২]

এই ভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগের কাব্য-নাটক-উপন্যাস সাহিত্যেও বহুল প্রবাদের হদিশ মেলে। বস্তুতঃ যে সকল সাহিত্যে গ্রন্থ নামকরণই প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

১. “আলালের ঘরের দুলাল।” - প্যারিচাঁদ মিত্র (টেক চাঁদ ঠাকুর)

২. “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।” - মধুসূদন দত্ত

৩. “সধবার একাদশী” - দীনবন্ধু মিত্র

বাংলা প্রবাদ অতীতকাল থেকেই সংগৃহীত হয়ে আসছে বর্তমান কাল অবধি। সেই তুলনায় সংগৃহীত প্রবাদের চর্চা বা বিশ্লেষণ সেই পরিমাণে হয়নি। যদিও বর্তমানে অনুসন্ধিৎসু বহু গবেষকদের নিকট, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। কারণ প্রবাদ বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক, নৃ-তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করা যায়। যা বাংলা সাহিত্যকে নানান দিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

লোকসাহিত্য চর্চার প্রথম যুগে, সর্বপ্রথম প্রবাদচর্চার প্রতিই সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এর মুখ্য কারণ লোকসাহিত্যের অন্তর্গত অন্যান্য বিভাগগুলির তুলনায় প্রবাদের ব্যবহার প্রাত্যহিক জীবনে সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রবাদের ব্যবহার নিতান্ত সীমিত হলেও অতীত কালে প্রবাদের ব্যবহার ছিল সুদুর প্রসারী। সর্বপ্রথম প্রবাদ চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন উইলিয়াম মর্টন। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম মর্টন কর্তৃক ‘দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ’ যা

প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ মূলক পুস্তিকা। তাঁর প্রবাদ পুস্তকে ৮০৩ টি বাংলা, ৭০ টি সংস্কৃত প্রবাদের ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৩৫-৩৬ সালে আরো একটি প্রবাদ পুস্তক প্রকাশ করেন "Calcutta Christian observer" পত্রিকায় "Bengali Proverb" নামে প্রায় ১৫০ টি প্রবাদ প্রকাশিত হয় (Christian observer : Vol-IV, 1835 PP 177-7, 303-7, 532-37, 590-94)। এই প্রবাদ পুস্তকের বহুপূর্বে ১৮২৫ সালে 'বঙ্গদূত' পত্রিকার সম্পাদক নীলরতন হালদারের ২০৩ টি প্রবাদ নিয়ে 'কবিতারত্নাকর' প্রকাশ পায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে। যদিও উক্ত প্রবাদ পুস্তকটি সংস্কৃত প্রবাদের সংকলন। সেই হেতু বাংলা প্রবাদ চর্চায় সর্বপ্রথম একজন বিদেশী মিশনারী উইলিয়াম মর্টনের গ্রন্থটির গুরুত্ব সর্বাধিক। ১৮৩৮-৩৯ সালে পাদরী জেমস্ রেভারেন্ট লঙ সাহেব কর্তৃক দুটি খণ্ডে বাংলা 'প্রবাদমালা' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে ২৩৫৮ টি প্রবাদ নিয়ে ১৮৬৮ সালে 'প্রবাদমালা' প্রকাশিত হয়। ২য় খণ্ডটি 'ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ' প্রবাদমালা ১৮৬৯ সালে, ৩৪২৯ টি প্রবাদ নিয়ে Calcutta School Book and vernacular literature Society দ্বারা প্রকাশিত। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত "Captain T.H.Lewin Gi Hill proverbs of the inhabitanis of Chittagong Hill Traets." ১৮৫১ সালে লর্ড সত্যার্নব বাংলা মাসিক পত্রিকায় ২১ পৃষ্টার পুস্তিকা "Bengali Proverb" ১৭৬ টি প্রবাদ নিয়ে সংকলিত। ১৮৮৬ সালে উমেশচন্দ্র সম্পাদিত বামাবোধিনী পত্রিকায় (জৈষ্ঠ সংখ্যার পত্রিকা, ২৫৭ সংখ্যা, ৩য় কল্প, ৩য় ভাগ) কয়েকটি পরপর ধারায় প্রবাদ প্রকাশিত হয়। কানাইলাল ঘোষাল কর্তৃক "প্রবাদ সংগ্রহ" এবং মধুমাধব চট্টোপাদ্যায় কর্তৃক "প্রবাদ পদ্মিনী" প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে। ১৮৯৩ সালে দ্বারকানাথ বসু প্রণীত প্রবাদপুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ সালে রেভারেন্ড কে.কে.জি. সরকার কর্তৃক মধ্যভারতের প্রচলিত প্রবাদে ১৩৬ টি হিন্দী প্রবাদ স্থান পেয়েছে। ১৮৯৭ সাল J. P. Anderson প্রণীত "Some Chittagong Proverbs" ৩৫২ টি চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রবাদ প্রকাশিত হয়। এছাড়া ভারতী, আর্য্যবর্ত, ভারতবর্ষ, প্রতিভা, প্রবাসী পত্রিকায় অসংখ্য ধারায় প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। এনামূলহক কর্তৃক "চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ" গ্রন্থটি এবং ১৩৩৬ সালে মহম্মদ হানীফ পাঠান কর্তৃক "পল্লীসাহিত্যের কুড়ানো মানিক" ঢাকা থেকে (১৫৩ টি প্রবাদ নিয়ে) প্রকাশিত হয়। সর্ব বৃহৎ শ্রেষ্ঠ প্রবাদ মূলক গ্রন্থ 'বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলিত কথা', (দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র-১৩৫৯ সালে) ড. সুশীলকুমার দে কর্তৃক প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ শনিবারের চিঠিতে প্রবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেছিলেন তা ধারাবাহিক সংখ্যায় প্রকাশ হতো। বাংলা সাহিত্যের এই সর্ববৃহৎ ও

শ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রসঙ্গে ডঃ বরুণ চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন, “ড. দে সম্পাদিত ‘বাংলা প্রবাদ’ (১৩৫২) গ্রন্থটি এ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা প্রবাদ সংকলন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।“[২৩] ১৩৬১ সালে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য “বাংলা লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড” এবং ১৩৫৯ সালে “বাংলা লোকসাহিত্যের ষষ্ঠ খণ্ডে” প্রবাদ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৩৬৪ সালে প্রবাদপ্রতীম সত্যরঞ্জন সেন কর্তৃক “প্রবাদ রত্নাকর” এ ৬৪৩২ টি প্রবাদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। ড. সুকুমার সেন মহাশয় “প্রবাদের প্রচলন” শীর্ষক গ্রন্থটিতে ১৩৫৬৫ টি প্রবাদ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের ‘বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র’ (১৪ই এপ্রিল ২০১৪, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা), “বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস” (এপ্রিল ২০০৮, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা-০৯), “লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ” (২০১৩, বইমেলা, কলকাতা) পুস্তকগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। ১৯৮০ সালে ড. দুলাল চৌধুরী মহাশয়ের ‘চাকমা প্রবাদ’। ড. পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর অনুসন্ধিৎসু মননে ‘লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ’ (জানুয়ারি ২০১০ তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা - ০৯) পুস্তকে প্রবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ড. বিজন বিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর ‘বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি’ এবং শ্যামাপদ মণ্ডল তাঁর ‘প্রবাদের আলোকে নদীয়া’ (১৯৯৫ সাল) প্রবাদ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বর্তমান কালেও ড. সুদেষ্ণা বসাক, ড. নমিতা মণ্ডল, শৈলেন দাস মহাশয়, মানিক লাল সিংহ মহাশয়, জলধর হালদার মহাশয় কর্তৃক বিভিন্ন লোকসাহিত্য গ্রন্থে প্রবাদগুলি চর্চিত হয়েছে।

সংজ্ঞা : প্রবাদ হল প্রকৃষ্ট বচন বা পরম্পরাগত উক্তি যা লোকসমাজের অভিজ্ঞতা লব্ধ সহজ-সরল-সংক্ষিপ্ত রসাভিব্যক্তি। সাধারণ মানুষের মুখে মুখেই প্রবাদের উৎপত্তি। লোক সমাজের অভিজ্ঞতা থেকেই তার উদ্ভব। সহজবোধ্য জীবন্ত মানুষের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত বাক্য হল প্রবাদ। সংক্ষিপ্ত উক্তিতে মানুষের অভিজ্ঞতার প্রকাশ পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনে কথায় কথায় উঠতে বসতে প্রবাদ উচ্চারিত হয়। সহজ বোধ্য অথচ সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আপাত তুচ্ছ হলেও গভীর উক্তি যা সাধারণ মানুষের নিজস্ব সম্পদ। প্রবাদ, ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল সাধারণ মানুষের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয় যা শ্রুতি পরম্পরা বাক্য বলে পরিচিত। ইংরাজী Proverb শব্দটি বাংলায় প্রচলিত অর্থে প্রবাদ নয়। প্রবাদের অভিধানিক অর্থ হরিচরণ মুখোপাধ্যয়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ অভিধান’ মতে, পরস্পর কথোপকথন, সম্ভাষপরম্পরাভিঘাত অন্যোন্য স্পর্ধা, লোকাপবাদ, লোকনিন্দা, পরম্পরাগত বাক্য, প্রসিদ্ধ লোকবাদ, কিংবদন্তী বাক্য, জনশ্রুতি ইত্যাদি অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। তদরূপ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ‘বাঙ্গালা ভাষার

অভিধানে’ প্রবাদ হল : পরম্পরাগত বাক্য, জনরব লোক-কথা জনশ্রুতি, নিন্দা, কুৎসা, অপবাদ। অর্থাৎ বাংলায় প্রবাদ সেই অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। যা ইংরাজীতে Proverb। বস্তুতঃ ইংরাজীতে Proverb শব্দটি বাংলায় ‘প্রবাদ’ হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৩২ সালে উলিয়াম মর্টন কর্তৃক “Bengali Proverb” এবং জেমস লঙ কর্তৃক ‘প্রবাদ মালা’ পুস্তকে Proverb শব্দের সর্বপ্রথম অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবুও Proverb শব্দের জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও অনেক পণ্ডিত বা মনিষীগণ ইংরাজীর Proverb শব্দটি বাংলায় গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। যদিও Proverb বা প্রবাদ একই অর্থে ‘পরম্পরাগত বাক্য’ বৈশিষ্ট্যটি উভয়েরই বর্তমান। সংস্কৃত বা ইংরাজী শব্দের অর্থ যাইহোক না কেন বাংলায় ‘প্রবাদ’ শব্দটিই সর্বাধিক লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। লোকসাহিত্যাকাশে প্রবাদ শব্দের নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যাইহোক বাংলা সাহিত্যকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে বাংলায় ‘প্রবাদ’ শব্দটির প্রচলনে।

প্রবাদের সংজ্ঞা নিয়ে নানান মুনির নানান মত। প্রবাদের বাধা ধরা নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। তবুও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যে সমস্ত সংজ্ঞা সহ নানান মত নির্ধারণ করেছেন, তা মতানুসারে নিম্নে উল্লেখ্য করতে পারি:

প্রবাদ সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে সর্বপ্রথম ইউরোপের স্পেন দেশীয় একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা থেকে।
ক. Proverb is a short Sentence baced on long Experience (দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ)

খ. সুশীল কুমার দে মহাশয় প্রবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, “প্রবাদের সাফল্য ইহার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ইহার সহজ প্রকাশভঙ্গীর উপর ইহার সাধারণ বুদ্ধির সরস চমৎকারিত্বের উপর, ইহার সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় প্রয়োগের সার্থকতার উপর।”[২৪]

গ. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, “প্রবাদ গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি।”[২৫]

ঙ. ড. ওয়াকিল আহমেদ মহাশয় বলেছেন, “একটি দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, প্রাণী, সম্পদ, উৎপাদন, ব্যবস্থা ও জাতির জীবনের নানা ধারা, তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, পরিবার, ঘর, সংসার ইত্যাদির বিবিধ ও বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবাদ রচিত।”[২৬]

চ. ড. পল্লব সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন, "মানুষের প্রাত্যহিক, বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিগুলির মর্ম নির্যাস সঞ্চিত হয়, যেসব সুসংগঠিত সরল অথচ বৈদগ্ধ্যভরা ঐতিহ্যবাহী উক্তিগুলির মধ্যে, তারাই হল প্রবাদ।"[২৭]

ছ. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন, "দীর্ঘদিনের প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতাই প্রবাদগুলিতে প্রতিফলিত হয়।"[২৮]

জ. ড. সুদেষ্ণা বসাক এঁর মতে, "জনজীবনে ব্যবহৃত দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ খণ্ড অথচ সংক্ষিপ্ত ভাববাহী বাক্যগুলি প্রবাদ প্রবচন রূপে স্বীকৃত।"[২৯]

বস্তুতঃ সংজ্ঞাসহ মন্তব্যগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখলে বোঝা যায়, বিভিন্ন দিক থেকে প্রত্যেকটি তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এক একটি সংজ্ঞা এক একটি দিক দিয়ে সঠিক। আবার বেশ কয়েকটি সংজ্ঞা রয়েছে যা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন তা যুক্তি-তর্ক দিয়ে খণ্ডন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্যঃ

* প্রবাদ মাত্রই যে সংক্ষিপ্ত বাক্য হতেই হবে তা নয়, দু চার লাইনের পদ দ্বারাও প্রবাদের ভাব প্রকাশ পায়। এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা না হলে ব্যক্তি জীবনের একক অভিজ্ঞতা দ্বারাও প্রবাদ অনুভূত হয়। (ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১)

* প্রবাদ সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণ, বৈদগ্ধপূর্ণ বাক্য যা লোকশিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত হয়। জ্ঞানের কথা প্রবাদে থাকে না। (আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪)

* প্রবাদে চিরন্তন সত্য কথা বা নীতি কথা থাকে না, থাকে প্রত্যক্ষ জীবন নির্ভর অভিজ্ঞতা। (আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪)

তবুও উপরিউক্ত এই সমস্ত মন্তব্যগুলির উপর গভীর ভাবে আলোকপাত করলে প্রবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কতকগুলি তথ্য পেতে পারি অর্থাৎ প্রবাদ হতে গেলে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আবশ্যিক সেগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

১) বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

২) অবয়ব : সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণ বাক্য।

৩) গঠন : শ্লেষ, বক্রোক্তি, ব্যঙ্গোক্তি, ব্যঞ্জনাধর্মী অন্যান্য অলঙ্কারের দ্বারা আবৃত।

৪) প্রকাশ : সমাজ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাক্য। এবং তীক্ষ্ণ বৈদগ্ধপূর্ণ বাক্য।

৫) প্রবাদে সরসতা থাকবে।

৬) ব্যক্তি অথবা সমষ্টির প্রাত্যহিক জীবনের অর্থবহ গভীর উক্তি।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহজ-সরস-সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণবাক্য যা বৈদগ্ধপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী অর্থবহ বাক্য সমষ্টিকে প্রবাদ বলতে পারি।

প্রবাদে প্রবচন প্রসঙ্গ : প্রবচন হল প্র✓বচ্ অন। অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বচন বা সদালাপ। “বঙ্গীয় শব্দকোষ” বাংলা অভিধান মতে, প্রবাদ-প্রবচন-বচন তিনটি শব্দই ‘বচ’ বা ‘বদ্’ (বলা) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। ১২৯৯ সালে প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত প্রবাদ পুস্তকের নাম বঙ্গীয় ‘প্রবচনাবলীতে’ প্রবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। অনুরূপ ১৮৮৬ সালে বামাবেধিনী পত্রিকায় বাংলা ‘প্রবচন’ এবং ১২৫৫ সালে মধুরামোহন বিশ্বাস প্রণীত ‘বাক্য বিন্যাস’ নামে পুস্তিকায় ‘প্রবাদ’ শব্দটি উল্লিখিত হয়নি। ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ অভিধানে, প্রবচনের অর্থ-উপদেশ, ব্যাখ্যান, বেদ্যাধ্যায়ন। অথচ প্রবাদ হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ দৈনন্দিন জীবনাচরণের প্রকাশ। হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, সহজ-সরল বৈদগ্ধ পূর্ণ বাক্য। নীতিকথা, আদেশ, উপদেশ, তত্ত্বজ্ঞান লোকশিক্ষা প্রবাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রবাদ ও প্রবচনের পার্থক্য হলপ্রবাদ আকারে সংক্ষিপ্ত দ্বিপদী বা দ্বি চরণ বিশিষ্ট। এবং প্রবচনগুলি প্রবাদের থেকে তুলনামূলক দীর্ঘতর এবং ছন্দবদ্ধ বাক্য। প্রবচন হল সমাজের প্রথম জীবনদর্শন এবং প্রবাদ হল জীবন দর্শনের সামাজিক নীতি। তদুপরি বলা যায়, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষে’ প্রবাদ ও প্রবচন শব্দ দুটির উৎপত্তি বচ্ বা বদ্ (বলা) ধাতু থেকে। বস্তুতঃপ্রবাদের পরিবর্তে প্রবচন শব্দটি ব্যবহার করেছেন অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ। কারণ তাঁদের মতে, বাংলা ভাষায় প্রবচন শব্দটির পৃথক ব্যবহার নেই, শুধুমাত্র প্রবাদ শব্দের সাথে প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবাদ শব্দটি ‘প্রবচনের’ সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্বরূপত, প্রবচনের কোন স্বাধীন ব্যবহার বাংলা শব্দভাণ্ডারে নেই।

প্রবাদে বচন প্রসঙ্গ : বচন শব্দের আভিধানিক অর্থ কথিত বিষয়। ভাষণ, বিধান, কথন, শাসন, অনুশাসন, আদেশপূর্ণ একটি বাক্য। যদিও বচনগুলি প্রবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তবুও প্রবাদেও এই সমস্ত গুণগুলি লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদও সমাজের অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রাত্যহিক জীবনের আদেশ, উপদেশ, ভাষণ বা উক্তি যা একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য। প্রবাদ ও বচন শব্দ দুটি বচ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।

তদুপরি আমরা সকল প্রবাদকে, বচন বলতে পারি না। তীক্ষ্ণ, ঝাঁঝালো বাক্যের দ্বারা মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো বা রূপক, উপমা, অতিশয়োক্তি, শ্লেষ, বক্রোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ প্রবচনে থাকে কিন্তু বচনে থাকে না। বাংলায় বচন বলতে ডাকের বচন, খনার বচনকেই বোঝায়। "কৃষি বিষয়ক, জলবায়ু, আবহাওয়া, সম্পর্কিত বচন হল ডাকের বচন।'ডাক' অর্থে জাদু সিদ্ধ পুরুষ; 'ডাকিনি' স্মার্তব্য। অধিকাংশ সময়েই এগুলি মূলত কৃষি ও শুভাশুভ কেন্দ্রিক নানা ধরণের বিধান এবং আদিম জাদু বিশ্বাস ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্কারকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।"[৩০] খনার বচনে জ্যোতিষ শাস্ত্র, গ্রহ, নক্ষত্রের শুভাশুভ কেন্দ্রিক নানা বিধি নির্দেশ আছে। খনা শব্দটি ক্ষণ>খন্+আ = খনা।

ডাকের বচন ও খনার বচনকে প্রবাদ বলা যায় না। যদিও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ প্রবাদ ও বচনে উভয়েই লক্ষ্য করা যায়। তবুও সকল খনার বচন ও ডাকের বচনগুলি প্রবাদ নয়। তবে বেশ কিছু ডাক ও খনার বচন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার পার্থক্য চোখে পড়ে না। যথাঃ

১. বামুন বাদল বান / দইখন্যা পেলেই যান।

২. খনা বলে চাষার পো / শরতের শেষে সরিষা রো।

৩. খনা ডেকে বলে খান / রোদে ধান ছায়ায় পান।

৪. মঙ্গলে ঊষা বুধে পা / যথা ইচ্ছা তথা যা।

উপরিউক্ত সমস্ত খনা ও ডাকের বচনগুলি প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

প্রবাদে প্রবাদাঙ্গ : অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত অসম্পূর্ণ ভাব প্রকাশক প্রবাদের অংশকে বলা হয় প্রবাদাঙ্গ। এটি পূর্ণাঙ্গ প্রবাদের খণ্ডাংশ। প্রবাদের মতো এরা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন, "প্রত্যেক ভাষার এমন কতকগুলি বাগ্‌ভঙ্গি আছে, তাহা কতকটা প্রবাদেরই অনুরূপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা প্রবাদ নহে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Proverbial phrase ও বাংলায় প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলা হয়।.... প্রবাদ দ্বারা যেমন একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়, এই প্রকার বাক্যাংশ দ্বারা তেমন কোন সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না; ইহা বাক্যের ভাব ও অর্থ প্রকাশের মাত্র, কিন্তু কোন স্বাধীন বাক্য নহে; সেই জন্যই ইহাদিগকে বাক্যাংশ বলা হইয়াছে"[৩১] যদিও প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের মিলটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। প্রবাদের মত প্রবাদমূলক বাক্যাংশেও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎটি প্রতিফলিত। প্রবাদাঙ্গেও রূপক, বক্রোক্তি, শ্লেষ,

অলঙ্কারের প্রয়োগ আছে। তাই প্রবাদ সংগ্রহ করার সাথে সাথে প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলিও পুস্তকে স্থান অধিকার করেছে। যথা :

১. রাবন মুখী হয়ে তেড়ে যাওয়া।

২. কোমর বেঁধে কাজে লাগা।

প্রবাদ প্রসঙ্গে বাগধারা : বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা বাগধারা হল দুই বা ততোধিক শব্দের গুচ্ছ বা একাধিক শব্দ পরস্পর যুক্ত হয়ে তাদের নিজের অর্থ ছড়িয়ে একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এরা বিশেষ অর্থ বহন করে এবং এদের সাহায্যে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য রচিত হয়। প্রবাদ ও বাগধারার মূল পার্থক্যটি হল:

প্রবাদ	বাগধারা
১. প্রবাদে ছন্দের মিল লক্ষ্য করা যায়।	১. বাগধারা হল গদ্যধর্মী।
২. প্রবাদ একটি স্বাধীন বাক্য।	২. বাগধারা সর্বদা বাক্যের সাথে প্রযুক্ত।
৩. একটি অর্থপূর্ণ বাক্য প্রকাশ করে। এটি পূর্ণ বাক্য।	৩. একটি বিশেষ অর্থকেই প্রকাশ করে। পরিপূর্ণ বাক্য নয়।
৪.প্রবাদের অন্তর্নিহিত অর্থ সীমাকে লঙ্ঘণ করে অসীমের দিকে যাওয়ার প্রবণতা থাকে।	৪. সাধারণত বাগধারার অর্থ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ।
৫. ব্যাক্তি থেকে সমষ্টিতে যাওয়ার নির্দেশ করে।	৫. ব্যক্তির উপর নির্ভর করে।
৬. যেমন : ফঁবর্য়া ঢেঁকির আওয়াজ বেশি।	৬. যেমন : অকাল কুষমাণ্ড (গুণহীন ব্যক্তি)।
৭. কর্তা কর্ম সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যে বর্তমান।	৭. বাক্যে কোন ক্রিয়াপদ নেই।
৮. ভাব প্রকাশে পূর্ণতা থাকে।	৮. ভাব সম্পূর্ণ নয়।

সুতরাং প্রবাদ ও বাগধারা ভিন্ন প্রকৃতির। বাগধারা হল বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ। অর্থের এই ব্যঞ্জনাই এখানে প্রধান। তবুও এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছকে প্রবাদের অংশ বলা গেলেও যে এইগুলি স্বরূপত প্রবাদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা উভয়েই নিন্দা বা ব্যাঙ্গের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার প্রবণতা দেখা দেয়। যথা :

১. অকাল কুষমাণ্ড (গুণহীন ব্যক্তি)।

২. কলুর বলদ (পরের জন্য শ্রম করে)।

৩. তীর্থের কাক (প্রাপ্তির আশায় দিন গোনা)।

৪. এঁচড়ে পাকা (অকাল পক্ক)।

প্রবাদে ধাঁধা প্রসঙ্গ : ধাঁধা ঐতিহ্যমূলক, তার প্রকাশ মৌখিক। এটি এক বা একাধিক, আপাত বিরোধমূলক বর্ণনাত্মক উক্তি থাকে যা রূপকাশ্রয়ী বা একাধিক আক্ষরিক অর্থ যুক্ত। ধাঁধা মূলত লোকশিক্ষার অন্যতম উপাদান। জটিলতা, রহস্যময়তা, দুর্বোধ্যতা ধাঁধার মূল বৈশিষ্ট্য। "দৈনন্দিন জীবনের অবকাশ যাপনের মুহুর্তে কেবলমাত্র মানসিক ক্রিড়াচ্ছলে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার এবং উত্তর দিবার রীতি প্রচলন রহিয়াছে।"[৩২] ধাঁধা মূলত বুদ্ধি ও পরীক্ষার প্রয়াস। অপরদিকে প্রবাদ হল সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার জীবন দর্শন। মনুষ্য বিদ্বেষ নয়, মনুষ্য বিদ্রুপই এর একমাত্র সামাজিক দায়বদ্ধতা। আচার্য সুশীল কুমার দে প্রণীত "বাংলা প্রবাদ" এ বেশ কিছু ধাঁধাকে প্রবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ প্রবাদের গঠন ভঙ্গির সাথে ধাঁধার প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছেঃ

১. আয়তনে সংক্ষিপ্ত।

২. পদ্যবন্ধ ও সরসতা উভয়েই দেখা যায়। যথা : ছাই ভিন্ন শুয়ে নাই / লাথ ভিন্ন খায় নাই। (কুকুর)

৩. উভয়েই অন্তর্নিহিত ভাব বা অর্থ ব্যাখ্যা যোগ্য। যথা : বন থেইক্যে বেরল্য হাঁতি / লইটক্যা লইটক্যা কান / ব্যাঁত দিগে ছেল্যা হয় দেগরে ভগবান। (কলাগাছ)

৪. আগে গা পরে পা / মাথায় দিয়ে নাইতে যা। ধাঁধার উত্তর 'তেল' কিন্তু প্রবাদে তা স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক ব্যবস্থা।

বস্তুতঃ ধাঁধা ও প্রবাদের মধ্যে বহু পরিমাণে পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। যথাঃ

১. ধাঁধা প্রধানত অবসর বিনোদন, বুদ্ধির অনুশীলন ও কৌতুক সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহৃত। অপরদিকে প্রবাদের উদ্দেশ্য জীবন অভিজ্ঞতার প্রকাশ। জীবনের কর্মস্থল ক্ষেত্রটিতে তার আধিপত্য।

২. প্রবাদের মতো ধাঁধার ভাষায় তীব্র, তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গ ও শ্লেষের ব্যবহার নেই।

৩. ধাঁধায় বৈদগ্ধ অপেক্ষা কবিত্বের প্রাধান্য। কিন্তু প্রবাদ ঠিক তার বিপরীত।

৪. ধাঁধার মধ্যে আলঙ্কারিক পদ যত বেশি ব্যবহৃত হয় প্রবাদে তা হয় না। সমস্ত রকমের আলঙ্কারিকতা বর্জন করে একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করাই এদের উদ্দেশ্য।

৫. প্রবাদ বাস্তবতার কঠিন জীবনাদর্শন। ধাঁধা কল্পনার রঙিন ফসল।

৬. প্রত্যক্ষ জীবন বোধের গভীরতার ছাপ প্রবাদে লক্ষ্য করা যায় বলে প্রবাদ আধুনিক সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। অপর পক্ষে ধাঁধা অবসর বিনোদনের কৌতুক-ক্রীড়া যা কল্পনার প্রসূত ফসল তাই বর্তমান সমাজ জীবনে তুলনামূলক প্রবাদ অপেক্ষা গুরুত্ব কম।

বস্তুতঃ জীবন বোধের গভীরতা প্রবাদের মধ্যে দৃষ্ট হলেও উভয়েই সমাজের আচার-আচরণ, সমাজচিত্র, পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করে রচিত হয়। উভয়েই আমাদের জীবনে অপরিহার্য উপাদান।

প্রবাদে ছড়া প্রসঙ্গ : ছড়া ও প্রবাদের কায়িক কাঠামো এক ও অভিন্ন প্রকৃতির। এবং প্রবাদের মতো ছড়াও কে, কবে, কখন রচনা করেছিল বা এর রচয়িতা কে বা কারা তা জানা যায় না। উভয়েরই বিষয়বস্তুতে সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হয়। তবুও ছড়া ও প্রবাদের বৈসাদৃশ্য অনেকাংশ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন, "এই ভাবে কৃচিৎ ছড়া এবং প্রবাদের ভাব এবং বক্তব্য একাকার হলেও ইহাদের আঙ্গিকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সর্বদা রক্ষা পায়।"[৩৩] পার্থক্যগুলি নিম্নে বিবৃত করা হল :

প্রবাদ	ছড়া
১. চিরন্তন মানুষের শাশ্বত বিশ্বাসটি লক্ষ্য করা যায় ছড়ায়।	১. প্রবাদের মধ্যে মানুষের বিশ্বাসের ভাব প্রকাশ পায় না।
২. ছড়া হল সহজ-সরল শিশু সাহিত্য।	২. প্রবাদ ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, তীক্ষ্ণ, ঝাঁঝাঁলো, শ্লেষ, বক্রোক্তি, রূপকের দ্বারা আবৃত বাক্য।
৩. ছড়া, অসংলগ্ন, চিরন্তন ব্যঞ্জনাহীন, সহজ-সরল তার গুণে স্পন্দিত।	৩. প্রবাদ অভিজ্ঞতা লব্ধ সমাজের অভিব্যক্তি।
৪.ছড়ায় বিশ্বাসের ভাব প্রকাশিত, তা চিরন্তন	৪. প্রবাদের মধ্যে অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশিত।

সত্য।	সমাজ-জীবনের সাথে সাথে মানোভাবও পরিবর্তনশীল। তাই চিরন্তন সত্য নয়।
৫. রূপের দিকে ছড়া দীর্ঘতর।	৫. প্রবাদ তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত।
৬. রচনার দিকে ছড়া শিথিল।	৬. প্রবাদ দৃঢ় সংবদ্ধ বা আঁটো-সাঁটো।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় "যাহা সাধারণ ভাবে সোজাসুজি বলা হয়, তাহা প্রবাদ নহে ছড়া।"[৩৪]

১. আয় আয় চাঁদ মামা টি দিয়ে যা / চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

২. ইকিড় মিকিড় চাম চিকিড় / চামের কাটা মজুমদার.....।

৩. ইঞ্জলি পিঞ্জলি ধা মশায় ধা / যত গুলি মশা আছে কালি তলাকে যা।

৪. পাঁচনিয়ার পিঁড়িং শাগ / যেমন আছু তেমন থাক।

পরিশেষে বলা যায়, প্রবাদের সংজ্ঞা, প্রবাদের উৎস, প্রবাদ চর্চা সম্পর্কিত নানান পরিচয়ের সাথে সাথে সাহিত্য ও সমাজে প্রবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিকে অস্বীকার করা যায় না। প্রবাদ হল দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ সংক্ষিপ্ত বাক্য। সমাজের দর্পণ স্বরূপ। প্রবাদের মাধ্যমে আমরা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সমাজকে উপলব্ধি করতে পারি। তেমনি মানুষটির সামাজিক পরিচয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। প্রবাদ সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে সচেতন করে তীক্ষ্ণ ও ঝাঁঝাঁলো বাক্যের মধ্য দিয়ে ভালো-মন্দের দিক নির্দেশ করে। পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবাদ আলোচনার পূর্বে প্রবাদ সম্পর্কিত মৌলিক ধারণাটি এই অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।প্রবাদ-প্রবোচন, প্রবাদ-বচন, প্রবাদ-প্রবাদাঙ্গ, প্রবাদ-বাগধারা, প্রবাদ-ধাঁধা, প্রবাদ-ছড়ার বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত ভঙ্গির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রবাদের লোকসমাজ-বৈশিষ্ট্য-ইতিহাসটিকে তুলে ধরা হয়েছে যা ভাষা-সমাজ ও সাহিত্যে প্রবাদের গুরুত্ব কতখানি তা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. বরুণকুমার চক্রবর্তী, 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-১৭।

২. সুশীল কুমার দে সম্পাদিত, 'বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলিত কথা', দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র-১৩৫৯, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-২।

৩. সুশীল কুমার দে সম্পাদিত, 'বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলিত কথা', দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র-১৩৫৯, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-২।

৪. সত্যরঞ্জন সেন, 'প্রবাদরত্নাকর', অবতরণিকা, পৃষ্ঠা-৫।

৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৭, সাহিত্য একাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী-০১, পৃষ্ঠা-১৩৯২।

৬. নির্মল দাস সম্পাদিত, 'চর্চাগীতি পরিক্রমা', সপ্তম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১০,কলকাতা, ভুসুক পাদ,৩ নং পংক্তি,পৃষ্ঠা-১২৬।

৭. নির্মল দাস সম্পাদিত, 'চর্চাগীতি পরিক্রমা', সপ্তম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১০,কলকাতা, ঢেণ্টন পাদ, ৩৩ নং পদ, ৪ নং পংক্তি, পৃষ্ঠা-১৯০।

৮. নির্মল দাস সম্পাদিত, 'চর্চাগীতি পরিক্রমা', সপ্তম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১০,কলকাতা, ঢেণ্টন পাদ, ৩৩ নং পদ, ২ নং পংক্তি, পৃষ্ঠা-১৯০।

৯. নির্মল দাস সম্পাদিত, 'চর্চাগীতি পরিক্রমা', সপ্তম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১০,কলকাতা, সরহ পাদ, ৩৯ নং পদ, ১১ নং পংক্তি, পৃষ্ঠা-২০৩।

১০. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ত্রয়োদশ সংস্করণ, ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পাহাড়ী, আরাগ \ ক্রীড়া \, পদ সংখ্যা-৪১, পৃষ্ঠা-২২৩ ।

১১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ত্রয়োদশ সংস্করণ, ২০১১,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, রামগিরি রাগ ঃ \ আঠতালা \, পদসংখ্যা-৪৮, পৃষ্ঠা-২২৭।

১২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ত্রয়োদশ সংস্করণ, ২০১১,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দাণখন্ড, পাহাড়ী, আরাগ : \ লগনী \ পদ-৭৮, পৃষ্ঠা-২৪৪।

১৩. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ত্রয়োদশ সংস্করণ, ২০১১,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, বিভাষরাগঃ \ কুড়ুক্কঃ \ রাধাবিরহ, পদ-৪১৮, পৃষ্ঠা - ৪৫২।

১৪. কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ, 'মনসামঙ্গল' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১০, কলকাতা-০৯, পদ সংখ্যা-৭৯ ক, পংক্তি-৮, পৃষ্ঠা-১৫৭।

১৫. অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', লঙ্কাকাণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-০৯।

১৬. খগেন্দ্র নাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'বৈষ্ণব পদাবলী', পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭৩, বিদ্যাপতি মাথুর পর্যায়, , প্রথম পংক্তি, পৃষ্ঠা-৯৩।

১৭. খগেন্দ্র নাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'বৈষ্ণব পদাবলী', পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭৩, চণ্ডীদাস, আক্ষেপানুরাগ, পংক্তি -১০, পৃষ্ঠা-৭৭।

১৮. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পঞ্চম সংস্করণ, ২০০২-২০০৩, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, গ্রন্থ সূচনা, পৃষ্ঠা-১২৯।

১৯. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পঞ্চম সংস্করণ, ২০০২-২০০৩, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ, পৃষ্ঠা-১৮৫।

২০. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পঞ্চম সংস্করণ, ২০০২-২০০৩, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, দেবগণ-নিমন্ত্রণ অংশ, পৃষ্ঠা-১৯৯।

২১. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পঞ্চম সংস্করণ, ২০০২-২০০৩, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ব্যাস, ব্রহ্মার কথোপকথন, পৃষ্ঠা-২৩৯।

২২. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পঞ্চম সংস্করণ, ২০০২-২০০৩, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ব্যাসকৃত গঙ্গা তিরস্কার, পৃষ্ঠা-২৩২।

২৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী, 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-৪৮।

২৪. সুশীল কুমার দে সম্পাদিত, 'বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলিত কথা', দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র-১৩৫৯, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-৫।

২৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ষষ্ঠ খণ্ড প্রবাদ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ সাল, দে'জ পাবলিশিং, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-১৬।

২৬. ওয়াকিল আহমদ, 'প্রবাদ ও প্রবচন', প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, আনন্দ ধারা, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃষ্ঠা-১৭।

২৭. পল্লব সেনগুপ্ত ,'লোক সংস্কৃতির সীমানাও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০ সাল, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-১৭১।

২৮. বরুণকুমার চক্রবর্তী, 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-১৭।

২৯. সুদেষ্ণা বসাক,'বাংলার প্রবাদ' প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা পৃষ্ঠা-৩।

৩০. পল্লব সেনগুপ্ত ,'লোক সংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-১৭২।

৩১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ষষ্ঠ খণ্ড প্রবাদ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ সাল, দে'জ পাবলিশিং, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-৪১।

৩২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ষষ্ট খণ্ড প্রবাদ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ সাল, দে'জ পাবলিশিং, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-০৯, ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা-৪১।

৩৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ষষ্ঠ খণ্ড প্রবাদ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ সাল, দে'জ পাবলিশিং, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা -৪০।

৩৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ষষ্ঠ খণ্ড প্রবাদ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ সাল, দে'জ পাবলিশিং, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-৩৭।